ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রির অবমূল্যায়ন রোধ করা প্রয়োজন

বর্তমানে আমাদের দেশে দু ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষা বলতে সাধারণ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লেখাপড়াকে বুঝায়। ইন্টারমিডিয়েট পাসের পর দুই বছর অধ্যয়ন শেষে বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি, তিন বছরে কোর্স সমাপনের পর স্নাতক সম্মান ডিগ্রি দেওয়া হয় এবং এর পর আর ২ বছর অধ্যয়নের পর মাস্টার ডিগ্রি দেওয়া হয়। অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট পাসের পর মোট পাঁচ বছর অধ্যয়নের পর মাস্টার ডিগ্রি দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরে কারিগরি বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বলতে বুয়েট, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (বিআইটি) এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের লেখাপড়াকে বুঝায়। উভয়ক্ষেত্রে লেখাপড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন। শুধু কাজের গতি-প্রকৃতির কিছুটা ভিন্নতার কারণেই দুধরনের শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন হয়েছে মাত্র। বিআইটি হতে চার বছর মেয়াদি (এইচএসসি পাসের পর) শিক্ষা কোর্স সমাপনের পরে ডিগ্রি দেওয়া হয়ে থাকে যা প্রকৌশল ডিগ্রি নামে পরিচিত এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হতে ৩.৫ বছর মেয়াদি (এসএসসি পাসের পর) ভোকেশনাল কোর্স সমাপনের পরে কারিগরি বা ভোকেশনাল সনদপত্র দেওয়া হয়ে থাকে যা কোনো ডিগ্রি নয় এবং এটা ইন্টারমিডিয়েট সমতুল্য বলে গণ্য।

তাও আবার আমাদের দেশে শতভাগ বাস্তবমুখী হাতেকলমের শিক্ষা পদ্ধতি কোথাও নেই। তাই কোনো জটিল ও কঠিন বা নতুন প্রকল্প সম্পাদন করতে হলে লাখ টাকা ব্যয়ে বিদেশী কনসালটেন্ট আমদানি করতে হয় নতুবা বিদেশি প্রশিক্ষণ নিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের দেশে বর্তমানে নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং এগুলোর পরিবহন ও বিতরণ কার্য সম্পাদনের জন্য পেট্রোবাংলা এবং এর কয়েকটা কোম্পানি রয়েছে। এই কোম্পানিগুলোতে যে প্রকৌশলী/টেকনিক্যালম্যান (ডিগ্রিধারী/অডিগ্রিধারী) রয়েছে তাদের কারো গ্যাস টেকনোলজির ওপর ডিগ্রি নেই। কারণ আমাদের দেশে এখনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্যাস টেকনোলজির ওপর অধ্যয়নের সুযোগ নেই। এই বিষয়ে ডিগ্রি না থাকলেও তারা চাকরিতে প্রথমে এসে সিনিয়রদের সঙ্গে কাজ করতে করতে কাজকর্ম আয়ত্ত করে নেয় এবং প্রয়োজনে বিদেশি প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করতে থাকে।

আমাদের দেশে সরকারি চাকরি অর্জন করতে হলে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে স্নাতক ডিগ্রি/টেকনিক্যাল হোক বা ননটেকনিক্যাল হোক ডিগ্রিধারী হলেই যে কেউ বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে কিন্তু ডিগ্রি নেই এমন কেউ অংশ নিতে পারে না, (টেকনিক্যাল/ ভোকেশনাল হলেও)। অর্থাৎ ডিগ্রিধারীরাই প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকরি লাভের অধিকারী হয়ে থাকে। এই প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকরির বর্তমান বেতন স্কেল হলো ৪৩০০-৭৭৪০/- টাকা।

আমাদের দেশের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রভাষক পদে চাকরি লাভের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (অনার্সসহ) মাস্টার ডিগ্রি এবং বেতন স্কেল হচ্ছে ৪৩০০-৭৭৪০/ টাকা।

সরকারি প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বেশ কিছু সংখ্যক আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, পাবলিক কর্পোরেশন এবং সেক্টর কর্পোরেশন রয়েছে। যাদের কার্যাবলী মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানেরই মতো তবে ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা পদ্ধতির পার্থক্য বিদ্যমান মাত্র। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সরকারেরই হাতে থাকে এবং লাভ লোকসান সরকারি হিসাবেই যায় বটে।

যেমন পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ জুটমিল করপোরেশন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিল করপোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা, বাংলাদেশ ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি।

এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ জাতীয় উৎপাদন ও উন্নয়নমূলক কার্যাদি পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে। এই সংস্থাগুলোতে বহুসংখ্যক কর্মীর কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। সরকারি নিয়োগবিধি এবং নিয়মনীতিতে পরিচালিত হলেও এই সংস্থাগুলোর বেতন স্কেলের ক্ষেত্রে ব্যাপক তারতম্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন পেট্রোবাংলা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে দেখা যায় যে, সহকারী প্রকৌশলী পদে (বিএসসি ইনজিনিয়ার) ২টি স্পেশাল ইনক্রিমেন্টসহ প্রথম শ্রেণীর বেতন স্কেল ৪৩০০-৭৭৪০/- টাকাতে নিয়োগ দেওয়া হয়। সহকারী কর্মকর্তা (ননটেকনিক্যাল-মাস্টার ডিগ্রিধারী) পদে জুনিয়র বেতন স্কেল ২ হাজার ৫৫০ থেকে ৫ হাজার ৫০৫ টাকাতে নিয়োগ দেওয়া হয়। উপসহকারী প্রকৌশলী পদে (ডিপ্লোমাধারী ডিগ্রিহীন) বেতন স্কেল ৩৪০০ - ৬৬২৫/- টাকাতে নিয়োগ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৫ সালে ডিপ্লোমাধারী প্রকৌশলীদের বেতন স্কেল এবং সহকারী কর্মকর্তাদের (মাস্টার ডিগ্রিধারী) বেতন স্কেল একই গ্রেড ছিল। কিন্তু ১৯৯৪-৯৫ সালে আমাদের দেশের বিএসসি প্রকৌশলী, চিকিৎসক এবং কৃষিবিদরা প্রকৃচি নামের সংগঠন করে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করলে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সংঘ সরকারের সঙ্গে একজোট হয়ে প্রকৃচিদের বাড়তি সুযোগ প্রদানের বিরোধিতা করে সরকারি আমলাদের সঙ্গে মিলে ৩৪০০/- টাকা বেতন স্কেল আদায় করে।

শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের মতো ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদেরও দেশব্যাপী শক্তিশালী সংগঠন থাকার কারণে তারা সংগ্রাম, আন্দোলন করে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সরকারি আমলাদেরকে জিন্দাবাদ/মুর্দাবাদ দিয়ে, তোষামোদ করে তাদের বেতন স্কেল বাড়িয়ে নেওয়াসহ বিবিধ সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সদা তৎপর থাকে। এমনকি বর্তমানে ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন কর্তৃক দেশের যুগোপযোগী চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা করে দেশে কারিগরি দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে তখন এই মহতী উদ্যোগকে নস্যাৎ করে তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য সরকারি চাকরি বিধি লঙ্ঘন করে ডিপ্লোমাধারী প্রকৌশলীরা মাঠে-ময়দানে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ ডিগ্রিধারী কর্মকর্তাদের কোনো প্রকার সংগঠন না থাকায় তারা কোনো আন্দোলন-সংগ্রাম করে তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া পর্যন্ত আদায় করতে সক্ষম হয় না। তারা সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী হয়েও নিম্নতর বেতন স্কেলে চাকরি করে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের শ্রমের, মেধার ও গভীর সাধনার্জিত সর্বোচ্চ ডিগ্রির কোনো মূল্যায়ন করা হচ্ছে। সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিচারপতি, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ননটেকনিক্যাল হওয়া সত্ত্বেও অন্য সাধারণ কর্মকর্তাদের দুর্ভোগের কথা ভাবেন না। তারা শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। কারণ আমাদের দেশে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার চেয়ে সাংগঠনিক আন্দোলন, সংগ্রাম, রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদেরকে জিন্দাবাদ/মুর্দাবাদ দেওয়া বা তোষামোদ করার দামই বেশি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। যা দেশ ও জাতির জন্য কোনো অবস্থাতেই মঙ্গলজনক নয়।

কেবল শিক্ষাগত শ্রেণীভেদের (টেকনিক্যাল/ননটেকনিক্যাল) ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রে বেতন স্কেল বা অন্যান্য আর্থিক বৈষম্য পৃথিবীর কোনো উন্নত দেশে নেই। বর্তমানে আমাদের দেশ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক টেকনিক্যাল কর্মকর্তা/ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশে কিছু দিন চাকরি করে অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে উন্নত দেশসমূহে অধিক আর্থিক সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশায় পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা বাংলাদেশে যে টেকনিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং পদে চাকরি করতো সেই পদে তো দূরের কথা কোনো টেকনিক্যাল পদেই চাকরি লাভে সক্ষম হচ্ছে না। সেখানে তারা যে কোনো সাধারণ পদে চাকরি করতে বাধ্য হচ্ছে। এমনকি আমাদের দেশের ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে গিয়ে হোটেল ম্যানেজারের চাকরি করছে।

পৃথিবীর উন্নত দেশের আলোকে আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত প্রথায় পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট/বাংলাদেশ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাস করে বের হলেই তাদেরকে উচ্চতর বেতন স্কেল ও বাড়তি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিধান বাতিল করা একান্ত অপরিহার্য। কারণ এতে দেশ ও জাতির কোনো প্রকার উপকার হয় না বরং আর্থিক লোকসান হয়। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্তদেরকে অবমূল্যায়ন করা হয় এবং শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টির ফলে কর্মক্ষেত্রে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা ও অব্যবস্থাপনার জন্ম দেয়। এতে একটি প্রতিষ্ঠান সুশৃঙ্খলিতভাবে পরিচালিত হয়ে তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়। এমনি সরকারি-আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাংলাদেশে কম নয়। এ জন্য অব্যবস্থাপনাই মূলত দায়ী।

তবে কোনো টেকনিক্যাল কর্মকর্তা বা ইঞ্জিনিয়ার যদি জাতীয় স্বার্থে বৃহৎ কোনো অবদান রাখার মতো নতুন পণ্য বা তথ্য প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে কাজের মূল্যায়নস্বরূপ সম্মানসূচক খেতাব বা স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা যেতে পারে। সবাইকে সমমূল্যায়ন করলে উদ্যমী উৎসাহীরা অনুপ্রেরণার অভাবে তাদের সৃজনী শক্তি প্রয়োগে সক্ষম হবে না। ইঞ্জিনিয়ার হলেই ঢালাওভাবে একনাগাড়ে সবাইকে উচ্চতর বেতন স্কেল ও ইনক্রিমেন্ট প্রদানের কোনো যৌক্তিকতা আদৌ আছে কিনা তা একবার খতিয়ে দেখা প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

এমটি ইসলাম
ঢাকা।